দৈনিক ইত্তেফাক

119

তারিখ 08 FEB 1987

পৃষ্ঠা ... 4 ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ইতিহাসের ক'টি পৃষ্ঠা

অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ
প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কোন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট ঘটনা যখন জনসমষ্টির গর্বের বস্তুতে রূপান্তরিত হয় তখন তা হয় ঐতিহ্য আর ঐতিহ্যের মালা গেঁথেই ইতিহাস ধন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস শুধুমাত্র একটা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস নয়, বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের অনেকখানিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস। এ জাতির অধ্যাত্ম সত্তার বিকাশে, এর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্ধারণে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ। ১৯২৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী সমাবর্তন ভাষণে লর্ড লিটন এরই ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেনঃ "এ বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র ঢাকার মহত্তম সম্পদ নয়, বাংলা এমনকি ভারতের বাইরেও ঢাকার গৌরব প্রসারে এ বিশ্ববিদ্যালয় অবদান রাখবে।" লর্ড লিটনের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, এদেশে যা কিছু সুন্দর ও সাধু, এ জাতি যা নিয়ে গর্ব করে তার প্রায় সবকিছুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুস্পষ্ট অবদান রেখেছে। এ উপমহাদেশ বিজিত হয়েছে বহুবার আর প্রায় সব বিজয়ী প্রবেশ করেছে পশ্চিমদ্বার দিয়ে। বিজয়ীর উল্লাস দক্ষিণ ও পূর্বে ধ্বনিত হয়েছে অনেক অনেক পরে। আঠার শতকের ভারত বিজয়ে এ ধারা পরিবর্তিত হয়। এবারে পূর্বদিক থেকেই ভারত অধিকৃত হোল। নৌশক্তির আধিপত্যেই তা সম্ভব হয়। ফলে বাংলাই হোল এবারে সর্বপ্রথম অধিকৃত। বাংলা বিজয়ের ভিত্তিতে মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সমগ্র উপমহাদেশে বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। এ প্রক্রিয়ায় সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলার মুসলমানরা। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, বিশেষ করে শিক্ষা দীক্ষা ক্ষেত্রে এ ক্ষতির গভীরতা ও ব্যাপকতা মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। এতে শাসকগোষ্ঠিও বিচলিত হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ তথা পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের সৃষ্টি বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ হিসেবে কেন এত জনপ্রিয় হয় তা এ প্রেক্ষিতে অনুধাবনযোগ্য। এ পদক্ষেপ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করে। তাঁরা আশা করেন, এর ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা দূর হবে আর পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব বাতায়ন খুলে যাবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের নিকট উপস্থাপিত প্রতিবেদনে ১৯১৭ সালে একজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী বলেনঃ "বাংলার মুসলমানরা যদিও এক ইহজাগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আগ্রহী তথাপি তাঁরা মনে করেন সে শিক্ষা ইসলাম ঐতিহ্য-ভিত্তিক হওয়া উচিত।" তাঁর মতে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যা প্রয়োজন তা হোল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ক্ষেত্রে তাঁদের যথাযথ অংশগ্রহণ। আসলে তাঁর বক্তব্য ছিল যথার্থ। ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত নতুন প্রদেশে শিক্ষায়তন পরিচালনায় মুসলমানদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। ফলে মুসলমান শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও বেড়ে ওঠে আশাতীতরূপে। এক হিসেবে দেখা যায় ১৯০৬ সালে কলেজ পর্যায়ে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ১৬৯৮ জন। ১৯১২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫৬০ জন। ১৯০৫ সালে বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ৬,৯৯,০৫১ জন এবং ১৯১১ সালে তা হয় ৯,৩৬,৬৫৩ জন।

১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে বংগভংগ রদ হলে মুসলমান নেতৃবর্গের প্রধানতম দাবী হয়ে ওঠে শিক্ষা বিস্তারকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী। ১৯১২ সালের ৩১শে জানুয়ারী ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, এ, কে, ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবর্গের যে প্রতিনিধিদল বাংলার মুসলমানদের দাবী-দাওয়া নিয়ে কথা-বার্তা বলেন তার মুখ্য লক্ষ্য ছিল বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দাবী। এ দাবী ছিল যুক্তিসংগত। তাই লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রতিনিধিদের বলেনঃ "সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলায় বংগভংগ রদ ভীষণ উদ্বেগের সাথে পরিলক্ষিত হচ্ছে," কেননা এর ফলে পূর্ব বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের গতি রুদ্ধ হ'তে পারে। শুধু তাই নয়, লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রতিনিধিদের নিকট সুস্পষ্ট অংগীকার করেন ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। তিনি পূর্ব বাংলার জন্য একজন শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগেরও সুপারিশ করেন।

গভর্ণর জেনারেলের ঐ সুপারিশ বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এ ধরনের সমালোচনা ও প্রতিবাদের প্রায় সবটুকুই আসে শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের কাছ থেকে। পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বলা হতে থাকে—"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৃটিশ রাজ আবার" ডিভাইড এণ্ড রুলের "আশ্রয় নিয়েছে", "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে", "বৃটিশ সরকারের মুসলমান ঘেঁষা নীতি রুখতে হবে" ইত্যাদি। ১৯১২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাশবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে বাংলার হিন্দু নেতৃবর্গ গভর্ণর জেনারেলের সাথে এক আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনায় বলা হয়, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হবে "ভেতর থেকে বাংলাকে বিভক্ত করার নামান্তর"। তাঁদের মতে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জনসমষ্টি মুসলমান আর মুসলমাদের সর্বাধিক জনসংখ্যা কৃষিকাজে রত। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে সরকার এ বিষয়ে কোন অবদান রাখবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি নাপছন্দ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন, "ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বাংলায় শিক্ষার স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করবে," যখন তিনি অনুভব করেন এ বিষয়ে সরকার দৃঢ়-সংকল্প, তখন তাঁর প্রতিবাদ প্রত্যাহার করেন এবং বিনিময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আরো চারটি অধ্যাপকের পদ দাবী করেন।

সরকারের সাথে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এ দেনা-পাওনাকে বলা হয়েছে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তি"।

শেষ পর্যন্ত বাংলা সরকার ঢাকায় প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা নির্ধারণের জন্য ১৯১২ সালের ২৭শে মে আর ন্যাথিয়েলের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির উল্লেখযোগ্য সুপারিশের মধ্যে ছিলঃ (এক) বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ও সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত, (দুই) এটি হবে আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়, (তিন) ইসলামিক শিক্ষা ও গবেষণা এর শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। ঐ বছরই ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। ভারত সচিব এ মর্মে নির্দেশ জারি করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে অবশ্য প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ মন্থর হয়ে ওঠে। ১৯১৭ সালের ২৩শে এপ্রিল আইনসভার সমাপ্তি অধিবেশনে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড চেমসফোর্ড লর্ড হার্ডিঞ্জের অংগীকার উল্লেখ করে অতি শীগ্‌গির ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করেন।

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না। ১৯১৭ সালের ৬ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য এম, ই স্যাডলারের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নামে পরিচিত। এ কমিশনের দু'টি সুপারিশ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যঃ (এক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তিকরণ ক্ষমতা থাকবে না। এটি হবে একটি একক (Unitery) মাত্রাবিশিষ্ট শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষায়তন। (দুই) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে স্বায়ত্তশাসিত একটি প্রতিষ্ঠান।

এভাবে বাংলাদেশের "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের" জন্ম হয় ১৯২০ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মাধ্যমে। এ আইনটি প্রণীত হয় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং তা গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি লাভ করে ১৯২০ সালের ২৩শে মার্চ। এ আইনের বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য নিযুক্ত হন পি, জে, হার্টগ P.J.Hartg)। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ বছর ধরে শিক্ষা বিভাগীয় রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯২০ সালের ১লা ডিসেম্বর তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালের ১লা জুলাই তিনটি অনুষদ (কলা, বিজ্ঞান ও আইন) ১২টি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার জয়যাত্রা শুরু করে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষক ছিলেন ৬০ জন (২৮ জন কলা অনুষদে, ১৭ জন বিজ্ঞান অনুষদে আর ১৫ জন আইন অনুষদে)। ঐ বছর সর্বমোট ৪৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে হাজার গুণ, অনুষদ ও বিভাগ বেড়েছে বহুগুণ, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু লক্ষ্যের দিক থেকে সম্ভবতঃ আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়েছি। পূর্ব বাংলা হয়েছে বাংলাদেশ। তাই বাংলাদেশের শিক্ষা জীবন তথা এ জাতির অধ্যাত্ম-সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য প্রায় অভিন্ন।